Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 05/September/2023 IJRAW: 2023; 2(10):70-74 Accepted: 10/October/2023

বরাক উপত্যকার বিভিন্ন জাতি এবং জনগোষ্ঠীর বিবরণ

*[1]Farida Yasmin Mazumder and [2]Joyrul Islam Choudhury

*[1]Student, Assam University, Assam, India.

[2]Teacher, Department of Education, Hailakandi Town High School, Assam, India.

সারসংক্ষেপ

বরাক উপত্যকা হল আসামের সবচেয়ে দক্ষিণাঞ্চলীয় অঞ্চল যা একটি বহুত্ববাদী সমাজ গঠনের দিকে নিয়ে যাওয়া রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে আগ্রাসন এবং উপনিবেশ, বাণিজ্য, অভিবাসনের মাধ্যমে নতুন বিভাজন, ক্ষমতার নতুন প্রান্তিককরণের মাধ্যমে আনা পরিবর্তনের ফলাফল। বরাক উপত্যকা, মূলত পূর্ব বাংলার একটি সম্প্রসারণ ছিল। 1874 সালে, আসামকে ব্রিটিশরা একটি প্রদেশ হিসাবে সংগঠিত করেছিল এবং সিলেট ও কাছাড়ের দুটি বাংলাভাষী জেলাকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে খোদাই করা হয়েছিল এবং নবগঠিত প্রদেশের রাজস্ব ঘাটতি মেটাতে আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই জেলাগুলি সুরমা উপত্যকা বিভাগ হিসাবে পরিচিত ছিল। অনাদিকাল থেকেই বরাক উপত্যকা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, সম্প্রদায় এবং সাংস্কৃতিক সত্তার লোকদের সঙ্গমস্থল। কিছু সময়ের জন্য, মধ্যযুগীয় সময়ে উপত্যকাটি টিপরাহদের অধীনে ছিল এবং তাদের রাজধানী ছিল বরাক নদীর তীরে খালংশায়, কিন্তু টিপরাহরা ধীরে ধীরে টিপরাহ পাহাড়ে চলে যায়। উত্তর কাছাড় পাহাড় তখন ডিমাসাসের অধীনে ছিল এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে তারা তাদের রাজধানী খাসপুরে স্থানান্তরিত করে কাছাড় উপত্যকা। ডিমাসারা সাধারণত পাহাড়ে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সমতল ভূমিতে খুব কম গ্রাম ছিল। ব্রিটিশ নথিগুলি উপত্যকায় বৃহৎ বাঙালি খেলার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয় এবং প্রাচীন মুদ্রা ও লিপিগুলি যথেষ্ট প্রমাণ দেয় যে উপত্যকাটি প্রধানত বাংলাভাষী ছিল। বর্মনরা, অর্থাৎ সমতলের ডিমাসারা, ধীরে ধীরে বাঙালি হয়ে গিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশদের অধিগ্রহণের পর কাছাড়ে বাঙালি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। 1960 সালে আসামের সরকারী ভাষার অধীনে বরাক উপত্যকার তিনটি জেলায় বাংলাকে সরকারী মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।

উপত্যকায় মুসলিম শাসনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, 13 শতক থেকে উপত্যকার অর্ধেকটি বাংলার তুর্কি-আফগান রাজবংশের অধীনে ছিল এবং মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে অব্যাহত ছিল। কিন্তু 1204 সাল থেকে এই মুসলিম আধিপত্য ও শাসনের অবসান ঘটে 1857 সালে বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের প্রবর্তনের মাধ্যমে। যেমন, উপত্যকায় প্রধানত হিন্দু ও মুসলমান এবং কিছু অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংখ্যা মাত্র। 1758 সালে মণিপুরে বার্মিজ দখলের সময় অনেক মণিপুরী কাছাড়, সিলেট এবং ত্রিপুরায় চলে আসেন। উপত্যকায় চা বাগানের প্রবর্তন ঔপনিবেশিক শাসনের সময় 1860 সাল থেকে ভারতের বিভিন্ন অংশ বিশেষ করে উত্তর ভারত থেকে অভিবাসীদের আমন্ত্রণ জানায়। অভিবাসীদের বেশিরভাগই চা-বাগানের শ্রমিক এবং তাদের সাথে রাজস্থানের কিছু ব্যবসায়ী বাণিজ্যিকভাবে এসেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাছাড়ের সমভূমিতে বিভিন্ন উপজাতির আধিপত্য ছিল। তারা ছিল প্রধানত ডিমাসা, কুকি, নাগা, রেয়াং, মণিপুরী এবং কোচ। বরাক উপত্যকা বাঙালি হিন্দু, বাঙালি মুসলমান, বর্মণ, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি, মিতি, হামার, রংমেই নাগা, খাসি, কুকি, প্রভৃতি সম্প্রদায় দ্বারা জনবহুল। অসমিয়া, রেয়াং, চাকমা, ধেন এবং চা বাগানের জনগণ। এই বিভিন্ন জাতির কাউন্সিল সমসাময়িক সময়ে উপকার জাতি এবং জনগোষ্ঠীর লোকস্কৃতি আলোচনা করা হচ্ছে।

মুখ্য শব্দ: বাংলা এবং বাঙ্গালি সমাজে হিন্দু-মুসলমান, ডিমাসা, রেয়াং, মণিপুরী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী।

ভূমিকা

ভাষা, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক দিক থেকে বিচার করে সহজেই বলা যায় যে, বরাক উপত্যকা বৃহত্তর বাংলারই একটি অংশমাত্র। বরাক উপত্যকার সংস্কৃতিক বিকাশের প্রক্রিয়া সংস্কৃতি বিকাশের সর্বভারতী সুত্রায়ান প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে বরাক উপত্যকা একটি বাঙালি প্রধান অঞ্চল হলেও প্রাচীনকাল থেকেই এখানে বিভিন্ন জাতি-উপজাতির বাস ছিল। তবে এখানকার আদিতম বাসিন্দা ঠিক কারা ছিলেন সেটা নির্দিষ্ট করে বলা প্রায় অসম্ভব। একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট যে এই অঞ্চলে আর্য সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিস্তার ঘটেছে। আসলে এ অঞ্চলের মাটি কৃষিকাজের পক্ষে খুব অনুকূল থাকায় যেটা কৃষিজীবী আর্যদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আর্যরাই এ অঞ্চলে কৃষির পত্তন করেছিল। তাদের আগমনে এই উপত্যকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। কারো কারো মতে এই আর্যদের আসার আগে এই উপত্যকা ইন্দো-মঙ্গোলীয় অধ্যুষিত ছিল। এসময় এখানকার পাহাড়ি এলাকায় বসবাসরত অস্ট্রিক ও মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর আদিবাসীরা আর্যদের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে মূল স্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন এভাবেই ভারতের সমস্ত পূর্বাঞ্চলের মতোই এই উপত্যকায়ও বাঙালির জাতির বিবর্তন হয়েছিল। একটা বিষয় স্পষ্ট যে বরাক উপত্যকায় অস্ট্রিক, ইন্দো মঙ্গোলয়েড ও অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও

*Corresponding Author: Farida Yasmin Mazumder

আর্যদের সংস্কৃতির মিশ্রণে এ অঞ্চলে জাতি গঠনের সূচনাপর্ব রচিত হয়। ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে যে রাজত্বের সূত্রপাত হয় ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ অধিগ্রহণ পর্যন্ত ছিল তার স্থায়িত্ব। ক্রমান্বয়ে ত্রিপরী রাজত্বের প্রতিষ্ঠা, তুর্ক ও আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা ও ইসলাম ধর্মের প্রসার, কোচ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা, ডিমাসা রাজত্বের প্রতিষ্ঠা, মণিপুরিদের আগমন ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা, চাশিল্পের পত্তন, স্বাধীনতা, দেশভাগ, তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে সামাজিক-রাজনৈতিক সংকট ইত্যাদি ঘটনা এ অঞ্চলের জাতিগঠনের বা জনবিন্যাসের রূপরেখা তৈরি করেছিল। তাই এখানকার সামাজিক জীবনে একটা মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বরাক উপত্যকায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসবাস হওয়াতে এখানকার লোকসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও স্বতন্ত্র। এই লোকসংস্কৃতির অন্যতম সমৃদ্ধ শাখা হচ্ছে লৌকিক আচার। এই লোকাচারের সঙ্গে একটি গোষ্ঠীর লোকধর্ম, লোক বিশ্বাস ও লোকসংস্কার ইত্যাদি যুক্ত থাকে। বরাক উপত্যকা যেহেতু মিশ্র জনগোষ্ঠীর বাসস্থান, তাই এখানকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিয়ের আচারে নানারকম বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। আবার বেশ কিছু আচারে সমন্বয়ের সুরও ধ্বনিত হয়। বলাবাহুল্য যে বরাক উপত্যকার বহু বহুরৈখিক এবং আপাত জটিল শাস্ত্রীয় ব্যাপার গুলো বাদ দিয়ে উপত্যকার সামাজিক অনুষ্ঠান এবং উৎসব, আচার-আচরণ ও দৈনন্দিক জীবনে ব্যবহার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে ভাবে জড়িত। বরাক একটি সমৃদ্ধ জনজাতি যেখানে তাদের স্বকীয়তা ও লোকসংস্কৃতি অত্যন্ত মৌলিক। তাদের বহুল ভাষা, শৈলী, পারিধিতা, প্রত্যাশা, এবং ধর্মীয় অভিমতগুলি তাদের সংস্কৃতির মূল ঘটক। বরাকের লোকসংস্কৃতিতে গান, নৃত্য, চিত্রকলা, শিক্ষা, গবেষণা, ধর্মীয় আচরণ, এবং সামাজিক উৎসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের প্রাচীন কাহনি বা গল্পগত পরিপর্তন তাদের ঐতিহ্য, ধর্ম, এবং সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। বরাকের সংস্কৃতি তাদের আত্মবিশ্বাস ও বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করে এবং তাদের সামাজিক সংস্কৃতি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ করে।

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিবরণ

বাঙালিরা: বাঙালিহিন্দুরা দুর্গাপূজা,কালীপূজা,সরস্বতী পূজা, সূর্যব্রত, শিবরাত্রি, দোলযাত্রা, বারাণী পূজা, মনশা পূজা,সিতালীপূজা,কার্তিকসংক্রান্তি,পৌষসংক্রান্তিষষ্ঠী, রথযাত্রা, দোলপূর্ণিমা, লক্ষ্মী পূজা, নৌকা পূজা, দশা-অবতার পূজা, ইহুলন যাত্রা, ফুলদল, রূপসী পূজা, সাবিত্রী ব্রত, মঙ্গলচণ্ডী পূজা, আতনাজের ব্রত, কর্ম পুরুষ ব্রত, চড়ক পূজা প্রভৃতির উৎসব পালন করে। এছাড়া মেলা বা মেলাও রয়েছে অনুষ্ঠিত বারুণী যাত্রার সময় সিদ্ধেশ্বর মেলা, ভুবন শিবরাত্রির মেলা, ভরম বাবার মেলা, পোষ মেলা, গান্ধী মেলা,মহালয়ার দিনে মেলা, যা উদযাপনের উত্সাহ যোগ করে। সেখানে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ঐতিহাসিক গুরুত্বের অসংখ্য উপাসনালয় ও মন্দির।শিলচরে দুটি কালীবাড়ি মন্দির স্থাপিত হয়ে আছে। উনিশ শতকের শেষের দিকে। শিলকুড়ির বারামথান এবং উদ্ধরবন্দে কাঁচাকান্তি বাড়ি এবং খাসপুরে রণচণ্ডী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়

হেরাম্বা শাসনামলে এবং ধর্মপ্রাণদের দ্বারা উচ্চ সম্মানে রাখা হয়েছে হিন্দু সুভঙ্গের একটি শিব মন্দিরের উল্লেখ আছে খ্রিস্টীয় শতাব্দী এবং ভুবন পাহাড়ে হর-পার্বতীর ছবি সম্ভবত টিপ্পারা বসিয়েছিল, বদরপুরঘাটের শিব মন্দির কপিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলে জানা যায় সাংখ্য দর্শনের বিখ্যাত লেখক মুনি। এই সমস্ত মাজার আর্ক হিন্দুদের দ্বারা পবিত্র বলে বিবেচিত এবং এর স্থান হিসাবে অব্যাহত রয়েছে তীর্থস্থান।

বরাক উপত্যকার বাঙালি মুসলমানদের একটি উল্লেখযোগ্য পরিচয় রয়েছে এবং রয়েছে সমৃদ্ধ

ঐতিহ্যবাহী প্রথা এবং অনুশীলন যা এর লোক সংস্কৃতিতে অবদান রাখে উপত্যকা কাছাড়ের বাঙালি মুসলমানরা বেশিরভাগই সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত। হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই বাঙালিদের মধ্যে চর্চা।তারা দক্ষবাঁশের কারুকাজ এবং মাদুর তৈরি করা, কুলা,চালনি হাত-পাখা ডালা মাছ ধরা প্রবন্ধ, বিভিন্ন আকার এবং আকারের ঝুড়ি, বেডস্টেড মৃৎপাত্র তৈরি করা বাঙালিদের আরেকটি অপরিহার্য পেশা। অধিকাংশই গ্রামবাসী কৃষিবিদ অবশ্যই, আজকাল বেশিরভাগ যুবক চাষাবাদ পছন্দ করে না এবং তারা অন্যান্য চাকরিতে বেশি আগ্রহী।

বরাক উপত্যকার বাঙালি মুসলমানরা বৎসরে দুই-বার ঈদ উদযাপন করে,এবং মোরম উৎযাপন করে আড়ম্বর হিসাবে জারি গানওনাচ পরিবেশিত হয়। গাজীর নাচ-গান বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয়। সংস্কৃতীর রঙ্গ'-এ মারিপাতি গান এবং ইসলামিক ধর্মীয় গানের কথা উল্লেখ করে।

এছাড়া হিন্দু ও মুসলমানদের সাধারণ উপাধি আছে যেমন চৌধুরী, মজুমদার,বিশ্বাস, ভুইয়া, লস্কর প্রভৃতি এই উপাধিগুলো ছিল তাদের প্রদত্ত রাজস্ব উপাধি কাছারি রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র দ্বারা । বেশিরভাগ বাঙালি হিন্দু পরিবারগুলো একবিবাহ পালন করে। শহর এলাকায় বেশির ভাগ পরিবার পরমাণু যেখানে গ্রামে এখনও যৌথ পরিবারের প্রচলন রয়েছে। সারিনাচ ধামাইল, বাউনাচর বধূবরণ, ওঝা নাচ, চরকনাচ কয়েকটি বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠানে বাঙালি হিন্দুদের দ্বারা পরিবেশিত নৃত্য। বারমাশির গান, লোকগীত, পাউলিগান, বিয়ের গান, ধর্মীয় গান, সারিগান,

বাউলগান,দুলারগান,লুটারগান এবং কীর্তন প্রধান গান। এগুলো ছাড়াও,বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রতিটি অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য গান গাওয়া হয়।

ডিমাচা/বর্মণ: ডিমাচা উত্তর-কাছাড়স্থ কাছাড়ীগণ নিজেকে ডিমাচা নামে অভিহিত করে। তাদের মতে ডিমা চা শব্দের অর্থ হল-(ডুই মা= বড় নদী, ছা=সন্তান) শব্দে বড় নদীর তীরবাসী লোক অথবা বৃহৎ নদীর সন্তান বুঝায় ।কাছাড়ীরা ব্রহ্মপুত্র নদীকে ডিমা বলিয়া থাকে। এই নদীর উপত্যকায় বহুকাল বসবাস করার পর শিবসাগর জিলায় ডিমাপুরে রাজ্য স্থাপন করিলে ডিমাচাদিগের পুরী ডিমাপুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ডিমাচা জাতির মধ্যে যাহারা আপনাদিগকে ভীমের বংশধর জ্ঞানে ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন গ্রহণ ও হিন্দুধর্ম্মের অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করিতেছে তাহারা নিজেকে বর্ম্মণ বলে সম্মদনকরে। বর্মন আদিবাসীর চার-অনুষ্ঠান তাদের সাংস্কৃতিক এবং জীবনযাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের আচার-অনুষ্ঠান মূলত ধর্ম, পরিবার, সমাজ, বীজগণিত এবং সাংস্কৃতিক অংশে নির্ভর করে। পৌরাণিক কাহিনী তাদের পিত্রী আচারী (ভীমের অনুসারী)হিসাবেবিবেচনা করেমহাভারতের দ্বিতীয় পাণ্ড) এবং তাদের ক্ষত্রিয় বলে মনে করা হয়। ভিতরে কাছাড় বর্মনরা বাঙালি হিন্দুদের অনুসরণ করে এবং বাঙালি হিন্দুকে ডাকে যাজকদের বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের সময় তাদের ধর্মীয় আচার পালন করতে হবে এবং তারাও বাঙালি ব্রাহ্মণদের মতো পবিত্র সুতো পরে। একপাশ থেকে অন্যপাশে যাইতেসে কাছাড়ের বর্মনরা সংস্কৃতকরণ করে তাদের অনেক পুরাতন ও বর্জন করেছ,ঐতিহ্যগত অনুশীলন কাছাড়ের বর্মনরা মূলত কৃষিজীবী এবং ধান তাদের প্রধান ফসল। বর্মনরা গাঁজানো চালের মদ পছন্দ করে যাকে তারা খার বলে

পানি তারা শুকনো এবং তাজা উভয় মাছই পছন্দ করে। শুকনো মাছ (nqflam) প্রস্তুত করা হয় বাঙালি বা মণিপুরীদের মধ্যে পাওয়া যায় না। তারা হলুদের সাথে লেবু পাতা এবং পাউডার সংরক্ষণকারী হিসাবে ব্যবহার করে ছোট মাছের শুঁটকি। তারা বাঁশের সিলিন্ডারে শুকনো মাছ সংরক্ষণ করে এবং এটি সারা বছর ধরে রাখুন। এর ক্ষেত্রেও শুকানোর এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় শুকনো মাংস বর্মণরাও রাইস বিয়ারের শৌখিন এবং প্রতিটি উৎসব উপলক্ষেই
রাইস বিয়ার দিয়ে উদযাপন করা হয়। বর্মনদের ঘরবাড়ি (imh) তাদের মতো বাঙালিরা। তারা তাদের ঘর তৈরিতে বেশিরভাগ বাঁশ এবং শুকনো নল (চান) ব্যবহার করে।তাদের গৃহস্থালির বেশিরভাগ জিনিসপত্রও বাঁশের তৈরি। কাছাড়ের বর্মনরা বাঙ্গালীদের ড্রেস প্যাটার্ন অনুসরণ করুন যেখানে তারা বসবাস করছেন কাছাকাছি এলাকায় মণিপুরী অধ্যুষিত এলাকায় বাঙালি এবং মণিপুরি পোশাক। মাদ্রু আরেকজন
বর্মনদের দ্বারা চর্চা করা আদিম ধরনের রান্না। এ ধরনের রান্নায় তারা কোন তেল বা মশলা ব্যবহার করবেন না এবং শুধুমাত্র লবণ ব্যবহার করা হয়। তারা একটি বিশেষ প্রস্তুতিও শুকনো মাছ, ডিমের চারা এবং সবুজ মরিচ দিয়ে চাটনির রূপ। তারাও শৌখিন সংযোগ করে (বাঁশের কান্ড। কাচারী-বর্মন পরিবার সাধারণত একগামী হয়। সমগ্র বর্মন সমাজকে ব্যাপকভাবে শেমফং (পুরুষ গোষ্ঠী) শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।এবং জুলুস (মহিলা গোষ্ঠী)। ছেলেরা পিতার সম্পত্তি এবং পিতারও উত্তরাধিকারী হয় গোষ্ঠী যেখানে কন্যারা মায়ের বংশ এবং মায়ের সম্পত্তি ধরে নেয়। হোজাই বা পুরোহিতদেরকে অনুষ্ঠান করার জন্য ডাকা হয়, সংযোগ করে শেম্পং এবং জুলুস।

মণিপুরি: অসম বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকের বাসভূমি। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মোহময়ী এই ভূখণ্ডে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রব্রজন ঘটেছিল। এই জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে 'মণিপুরি' অন্যতম।
অসমের ব্রহ্মপুত্র ওবরাক উপত্যকায় মণিপুরিদের বসবাস রয়েছে। বরাক উপত্যকার কাছাড় হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ জেলায় মণিপুরিরা বাস করে। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে মান সেনা মণিপুর রাজ্য আক্রমণ করে। মণিপুরি প্রজাদের উপর মান সেনাবাহিনীর করা অত্যাচারে টিকে থাকতে না পেরে মণিপুরিরা কাছাড়, সিলেট (বর্তমান বাংলাদেশে) ইত্যাদি স্থানে এসেছিল বলে অনুমান করা হয়। পরবর্তীকালে এরা নিজের দেশে ফিরে না গিয়ে বরাক উপত্যকায় স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এই লোকেরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। বর্তমান হোজাই জিলা, কামরূপ মহানগর জেলার গুয়াহাটি, উদালগুরি, কার্বি আংলং, ডিমা হাসাও, উজান অসমের শিবসাগর, কাছাড়, ডিব্রুগড়,গোলাঘাট, লখিমপুর ইত্যাদিতেও কম বেশি পরিমাণে মণিপুরি ভাষার মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।
মণিপুরি মৈতৈ/মীতৈ শব্দে ভাষা ও সম্প্রদায় দুটোকেই বোঝায়। মৈতৈলোন বা মীতৈলোন হল মৈতৈদের ভাষা। লোন শব্দের অর্থ ভাষা। এরা তিব্বত-বর্মীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মীতৈ ময়েক মণিপুরিদের নিজস্ব লিপি। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে মণিপুরি ভাষা ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত হয়। মণিপুর, অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ছাড়াও দক্ষিণ-
পূর্ব এশিয়ার মায়ানমার ও বাংলাদেশেও এই ভাষার প্রচলন রয়েছে। অসম সরকার ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে মণিপুরি বসতিপ্রধান অঞ্চলের নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে। ও ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে হাইস্কুল পর্যায়ে মণিপুরি ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রচলন করেন। অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাস করা মণিপুরিরা স্কুল-কলেজ ইত্যাদিতে অসমিয়া ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। মণিপুরি বা মৈতৈ বা মীতৈ সমাজ সাতটি ‘য়েক-ছালাই' অর্থাৎ গোত্র বা উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত। সেগুলি হচ্ছে— মভাং (নিংথৌজা), লুয়াং, খুমন, মোইরাং, অঙ্কোম, বাবা ডানবা এবং চেংলৈ।
মণিপুরি সংস্কৃতি এবং আচরণ:-
এই জনগণের সমাজ, সংস্কৃতি এবং আচরণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। তাদের উৎসব এবং আচরণ সম্পর্কিত কিছু মুখ্য বিষয়গুলি নিম্নলিখিত হতে পারে।
সাংগাপ্রদোষ (ড্রাম) এবং নৃত্য: মণিপুরি সাংগাপ্রদোষ অত্যন্ত বিশেষ। তারা বিভিন্ন প্রকারের ড্রাম ব্যবহার করে এবং প্রাচীন নৃত্য প্রথা অনুসরণ করে।
রাস লীলা: এটি মণিপুরি সাংস্কৃতিক এবং আচরণ অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই আচরণে কৃষ্ণের রাসলীলা চিত্রিত হয় এবং নৃত্য ও সংগীতের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়।
লাইহাউড়াবা(LaiHaraoba):লাইহাউড়াবা হলো মণিপুরী সংস্কৃতির একটি মুখোমুখি উৎসব, যা মণিপুরের পূজার দেবী থাওর ও থাওরবি সংস্কৃতির প্রতীক। মণিপুরিরা মূলত কৃষিজীবী। তাঁদের সমাজও সংস্কৃতিও কৃষিভিত্তিক। মণিপুরি উৎসব 'লাই হরাওবা' কৃষিভিত্তিক হলেও লোকাচার জড়িত। 'লাই হরাওবা'র অর্থ হলো 'অদেখা দেবতার সন্তোষ সাধন'। এই উৎসব মণিপুরিদের সংস্কৃতির প্রতিবিম্ব স্বরূপ। তাঁরা আদিম জড়দেবতা 'উমংলাই পূজা প্রাঙ্গণে 'লাই হারাওবা' প্রতি বৎসর উদযাপন করেন। 'লাই হারাওবা'র প্রধান শিল্পী মাইবা-মাইবি। এই নৃত্যের প্রধান বাদ্যযন্ত্র হল পেনা। এটি বীণা জাতীয় এক রকমের বাদ্যযন্ত্র। 'থাবল চোংবি', 'মাইবি জগোই' (লাই হারাওবা নৃত্য) মণিপুরি সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। এই নৃত্য মণিপুরি জাতীয়ত ও জাতীয় ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করছে। এই উৎসব ছাড়াও মণিপুরিরা 'শজিবু চৈরাওবা' উৎসব বৈশাখ মাসে পাঁচদিন ব্যাপী নববর্ষ উপলক্ষে পালন করে।
আত্মীয়তা, বৈবাহিক সম্পর্ক, ‘য়েক' বা 'খেল' ব্যবস্থার দ্বারা মণিপুরিরা ধর্মীয় রীতি-নীতি, লোকাচারসমূহ রক্ষা করেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে জীবন নির্বাহ করছেন।
এই উৎসবে স্থানীয় লোকগণ মণিপুরী নৃত্য, গান, নাটক, কাহাল, ইত্যাদি প্রদর্শন করে এবং তাদের ধার্মিক বেলিফস প্রকাশ করে। সংগ্রহ করা 'লাইহাউড়াবা' দিনের সকালের এই সঙ্গীত দিয়ে আরম্ব হয়-'য়াকেব'গী ঈশৈ'-

'হয়ি হয় হুম হৈয়ুম
লাইগীসু লাইনিংখো ইবুংঙো
বাকমনরোইবনা চাংতু ইহুংতো
চিবুংঙো ইবুংঙো খোইয়ুমগী হে
হা ইবুংঙো অশি ওইবা নদাইরেম
হৈয়া লাউনবু শৈখাজরকুগে ইবুংতো।'

মীতে পূজা: মীতে জনগণ মীতে পূজা নামের একটি ধর্মিক উৎসব পালন করে। এই উৎসবে পূজা, গান, নৃত্য এবং সাংগাপ্রদোষের মাধ্যমে সংকীর্তন এবং ধার্মিক ভাবনা প্রকাশ করা হয়।
ফৈরোলিলা: মণিপুরি জনগণের মধ্যে ফৈরোলিলা নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা প্রচলিত। এই খেলাটি পুরাতন সময়ের মীতে রাজা-রানীর মধ্যে সংঘর্ষ নির্ধারণের জন্য প্রয়োজন ছিল।
ভাষা ও সাহিত্য: মণিপুরি, মৈতে এবং মীতের ভাষা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রেখে যায়। তাদের সাহিত্য, কাব্য, গান, নাটক

এবং গল্পগুলি তাদের ঐতিহ্যকে প্রকাশ করে এবং তাদের আচার-আচরণে অভিনব দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করে।
রস লীলা এবং নৃত্য: মণিপুরি জনগণ নৃত্য এবং সংগীতে বিশেষ দক্ষতা রেখে থাকে। তাদের রস লীলা এবং ক্লাসিক্যাল নৃত্য উৎসবগুলি তাদের সাংস্কৃতিক দক্ষতা ও সান্ত্বনা প্রদর্শন করে।
পরিধান এবং শিল্প: মণিপুরি এবং মৈতে জনগণের পরিধান অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাদের পরিধানে স্থানীয় শিল্প এবং ডিজাইনের মিশ্রণ রয়েছে, যা তাদের সংস্কৃতির একটি প্রতিষ্ঠান প্রদান করে।
'লৈমা দগোয়' অমনি খঙ্গ ঘোইরী জগোয়নচিংবা।
প্রেম সংগীত---'হোৱাৰ যোইনিদা ভানবা হৈনিদা
ডেলে পাই খরবনা পোঞ্জল্লপদা '
ধর্ম ও আচারণ: মণিপুরি, মৈতে এবং মীতের বৈষ্ণব ধর্ম এবং হিন্দু ধর্মের প্রভাব রয়েছে। তাদের ধার্মিক উৎসব এবং আচার-আচরণ দেখা যায় এবং তা তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ।
এই সমাচার থেকে প্রকাশিত তথ্য মধ্যে রয়েছে,
মণিপুরি বা মৈতে বা মীতে সমাজ সংস্কৃতি আচার আচরণ মণিপুরি, মৈতে এবং মীতে জনগণের সমাজ, সংস্কৃতি এবং আচার-আচরণ একটি সমৃদ্ধ এবং আকর্ষণীয় মিশ্রণ রেখে যায়।

রেয়া

ত্রিপুরী বংশের (টিপ্পারা) একটি উপজাতি রেয়াংরা করিমগঞ্জের পাথেরকান্দি থানার কাছে এবং হাইলাকান্দির লালা ও কাটলিচেরা থানার কাছে কাছাড় এর ভাগা থেকে প্রায় ১৬ কি.মি দূরত্বে কলাখাল এ বর্তমানে তাহার পাহাড়ে পুঁজি করে আছে । রিয়াংরা তিব্বেতো-বর্মন জাতিগত স্টকের অন্তর্গত। তারা বিস্তৃতভাবে দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়, যথা-মুয়াল সুই গোষ্ঠী এবং মাসকা গোষ্ঠী।তাদের উপভাষা হল বেলাং, তবে বাঙালিদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করার সময়,তাদের ভাষা বাংলা ভাষার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। রেয়াংরা গ্রামে বাস করে, প্রত্যেকের নেতৃত্বে একজন চৌধুরি নামে পরিচিত। তার অধীনে আরও বেশ কয়েকজন হেডম্যান রয়েছেন যাদের কারবারী বলা হয়। একজন কারবারি প্রকৃতপক্ষে প্রশাসক যিনি সম্প্রদায়ের সমস্ত অংশের প্রতিনিধিত্বকারী একটি পরিষদ দ্বারা তার কাজে সহায়তা করেন। চৌধুরী গ্রাম পরিষদের সভাপতি। রেয়াংদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হল বাইশেই, একটি বসন্ত উৎসব যা বৈশাখের প্রথম দিনে উদযাপিত বাংলা নববর্ষের অনুরূপ। বাঙালী হিন্দুদের মতই তারা নতুন জামাকাপড় পরে সেই সাথে গান গায়, নাচ করে এবং ভাতের পিঠা এবং মাংস খায়। তারা রাইস বিয়ার বা ভদকাও গ্রহণ করে বাসি পূজার মতো অন্যান্য উৎসব এবং অনুষ্ঠান রয়েছে যেখানে তারা আরা পান করে, যা এই অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়।তাদের কিতাব রাই-বেসে খুইমা এবং সাকচা মা বাই মাও নৃত্যগুলি শুধুমাত্র মহিলারা পরিবেশন করে যেখানে জারারি ঝেম হল একটি নৃত্য যেখানে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই একসাথে নৃত্য করে। Reangs হল পৌত্তলিক যারা প্রকৃতির পূজা করে। তারা হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং তাই তারা শিব এবং দেবী কালীর পূজাও করে। তারা মারাই কাতারের মতো অশুভ আত্মাদেরও পূজা করে। রেয়াংরা পশু বলিতে বিশ্বাস করে। রেয়াংদের প্রধান পেশা কৃষি।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা মেতেই মণিপুরীদের মতো বরাক উপত্যকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বিষ্ণুপ্রিয়া, নাম অনুসারে, ভগবান বিষ্ণুর অনুসারী এবং বৈষ্ণবধর্মকে তাদের ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মহিলারা রাসলীলা করে এবং পুরুষরা কীর্তন পরিবেশন করে। রাসলীলা দুই প্রকার; যেমন, গোপাল রাস এবং কৃষ্ণ রাসলীলা। গোপাল রাস অল্পবয়সী ছেলেরা পরিবেশন করে যেখানে শ্রী কৃষ্ণের রাসলীলা গোপীদের ভূমিকায় মেয়েরা পরিবেশন করে। গোপালদের পোশাকে ছেলেরা উদীখলা এবং রাক হাওয়ালা পরিবেশন করে, যেগুলো শ্রী কৃষ্ণের জীবনের আদলে তৈরি। এগুলি ছাড়াও কুরুক্ষেত্র, লঙ্কাকাণ্ড, কংসবধ ইত্যাদির মতো কিছু নাটকীয় অভিনয়ও করা হয়। পদহাল্লি বিষ্ণুপ্রিয়াদের আরেকটি নৃত্যশৈলী। ঢোল নৃত্য সাধারণত পুরুষদের দ্বারা পরিবেশিত হয় কিন্তু শিলচরের কয়েকজন মহিলা নৃত্যশিল্পী দ্বারা এটি পরিবেশিত হয়েছিল (সিনহা 2008)। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরাও বৃষ্টিকে ডাকে কৃষি মৌসুমে নাচ-গানের সঙ্গে দেবতা। বিষ্ণুপ্রিয়ারা সকল হিন্দু উৎসব পালন করে কিন্তু তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে। কার্তিক উত্সব তাদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য উদযাপন যা লক্ষ্মী পূর্ণিমা থেকে শুরু হয় এবং রাস পূর্ণিমা পর্যন্ত চলতে থাকে। এই উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় যাকে কার্তিকর ফান্না বলা হয় তারা হোলি বা ফাগুয়াও খুব উত্সাহের সাথে উদযাপন করে। এটি চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মদিনের স্মরণে একটি বসন্ত উৎসব। খোলা মাঠে শেড তৈরি করা হয়, এবং প্রতিটি বাড়িতে উদযাপনের পতাকা সহ খুঁটি তোলা হয়। সমগ্র সম্প্রদায় আনন্দ-উল্লাসে, রঙের সাথে খেলা এবং নাচ-গানে নিযুক্ত হয়। বিষ্ণুপ্রিয়ারা বৈষ্ণবদের অনুসরণ করে এবং এইভাবে তাদের বুকে তুলসীর মালা এবং পবিত্র সুতো পরিধান করে। বিষ্ণুপ্রিয়ারা তাদের মৃতদেহকে দাহ করে এবং কিছু কিছু আছে যারা কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর পরকীয়া অনুষ্ঠান করে না এবং বরং তারা নামকীর্তন করতে পছন্দ করে। অবশ্য বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের মধ্যে কিছু শৈবও আছে। বিবাহের ক্ষেত্রে, বিষ্ণুপ্রিয়ারা হিন্দু বিবাহের প্রজাপত্য রূপ অনুসরণ করে। এই ফর্মে কোনও আনুষ্ঠানিক বলিদান করা হয় না এবং বিবাহ কীর্তনের মাধ্যমে গান গাওয়া হয়। তাদের সমাজে বিধবার পুনর্বিবাহের অনুমতি রয়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়া সম্প্রদায়ে জাতিভেদ প্রথা রয়েছে।সকল অ-ব্রাহ্মণরা নিজেদেরকে ক্ষত্রিয় মনে করে।তাদের অধিকাংশই কৃষিজীবী এবং তাঁতশিল্প নারীদের পরিচিত পেশা। বিষ্ণুপ্রিয়াদের প্রধান খাদ্যের মধ্যে রয়েছে ভাত,শাকসবজি এবং মাছ। বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের পূর্বে তারা মাংস ও পানীয় গ্রহণ করত কিন্তু পরে তারা তা ছেড়ে দেয়। বিষ্ণুপ্রিয়া পুরুষের পোশাক হল ধুতি (একটি লম্বা কটি কাপড়) এবং পাঞ্জাবি (একটি লম্বা শার্ট) এবং মহিলারা দুই টুকরো পোশাক পরিধান করে; একটি উপরের অংশ জুড়ে যেখানে অন্যটি নীচের অংশ জুড়ে। তারা অলঙ্কারও পছন্দ করে এবং গলায় হেইকুরু, লাইকসাই এবং পুন্ডারেই থাপাক, কানের জন্য ঝামকা বা ক্যামি এবং কব্জির জন্য কব্জি দিয়ে নিজেদের সাজায়। বাঙালি হিন্দুদের মতো বিবাহিত মহিলারা সিঁদুর পরেন এবং চুল লম্বা রাখেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষায় বাংলা ও অসমীয়া ভাষার প্রভাব স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।

উপসংহার

একই আলো-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা এবং একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সুদীর্ঘকাল ধরে বসবাস করার ফলে বরাক উপত্যকার উপজাতি ও অউপজাতির লোকায়ত জীবনবৃত্তে সাংস্কৃতিক মিলন-মিশ্রণ প্রচুর পরিমাণে ঘটে চলেছে এবং

সমন্বিত সংস্কৃতিই এখানকার মানুষের জীবনচর্যাকে বর্ণময় করে রেখেছে। এই বিভিন্ন জনগোষ্টির মধ্যে প্রতিটির নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং জীবনধারা আছে, এবং তারা তাদের ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাংধন পূর্বক প্রাচীন সংস্কৃতি সংরক্ষণ করে যাচ্ছে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. লোকসাহিত্য পাঠ-মজুমাদর মানস দে'জ পাবলিকেশন 1999
2. Dutta, Debabrala. History of Assam Sribhumi Publishing Company. MG Roaol Calcutta, 1986.
3. কাছাড়ের ইতিবৃত্ত-গুহ উপেন্দ্র চন্দ্র-সেঞ্চুরী লিটারেচার ২০১৬। ৪.চক্রবর্তী ড.তিমির বরণ-মায়া পাবলিকেশন 1995।
4. বাংলার লোক সংস্কৃতি-আশুতোষ ভট্টাচার্য। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টি, ইন্ডিয়া 2017
5. https://www.thecho.in
6. https://www.sangbadpratidin
7. https://indianadibasi.com
8. জিরিবামী মণিপুরী ওরেল লিত্রেচার-দেবী ড. যুন্নাম বিমোটি দেবী-সাস পাবলিকেশন পেলেস কম্পাওনন্দ-২০ মক.